রণজিৎ গুহর ভাষাচিন্তা

সুকান্ত চৌধুরী

আমাদের ভাবতে ভাল লাগে, আমরা যা জানি তা স্থির নিশ্চিতভাবে জানি, আর জ্ঞানের সেই উপাদানগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে একটা নিটোল চিত্র বা কাঠামো তৈরি করা যায়। জ্ঞানের অগ্রগতি কিন্তু আদতে ঘটে প্রায় উলটো পথে : একটা অপূর্ণ নির্মাণের ফাঁক-ফোকর ভরে ভরে, উপরন্তু সেই নির্মাণটাকেও ভেঙে পালটে, প্রশ্ন তুলে ধন্দে ফেলে। মাঝে মাঝে সেই ভাঙাগড়ার খেলা হয় রীতিমত জবর, অভ্যস্ত কাঠামোর ভিত নাড়িয়ে দিয়ে। এমন সন্ধিক্ষণকে বিজ্ঞানী টমাস কুহ্ন নাম দিয়েছিলেন paradigm shift — বাংলায় 'ধারাপাতিক পরিবর্তন' বলা চলে, যদিও তা আক্ষরিক তর্জমা নয়। এমন পরিবর্তনের ফলে কুহ্ন যাকে বলছেন normal science, বিজ্ঞানের অভ্যস্ত ধারা, সেটাকে প্রবলভাবে প্রশ্নের মুখে ফেলে বিদ্যাচর্চার একটা নতুন যুগের সূচনা হয়, অনুসন্ধানের একেবারে নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়।

কুহ্ন স্পষ্ট বলছেন তাঁর এই জ্ঞানের অগ্রগতির মডেল কেবল বিজ্ঞানের বেলায় খাটবে, সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে নয়; অথচ কৌতূহলের বিষয়, সমাজবিদ্যা তথা মানবিকবিদ্যার আলোচনায় 'প্যারাডাইম শিফট' কথাটা আকছার ব্যবহার হয়, হয়ত বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি। তাই আশ্চর্যের কিছু নেই, যদি দেখি রণজিৎ গুহ তাঁর 'The Small Voice of History' প্রবন্ধে (Small Voice ৩০৫) নিম্নবর্গের ইতিহাসতত্ত্ব পাড়তে কুহ্নের নাম করেই normal science এর ধারণার উল্লেখ করছেন। রণজিতের প্রতিবেদন, রেনেসাঁস থেকে ইউরোপে ইতিহাসচর্চার প্রচলিত ও প্রবল ধারা উচ্চবর্গের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক (statist) ইতিহাস, ঔপনিবেশিক প্রভাবে সেটাই শিকড় গজিয়েছে আমাদের মতো দেশেও। সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিহাসচর্চার normal science। তার বিপ্রতীপে রণজিৎ স্থাপন করছেন নতুন ধারা, সাবঅলটার্ন স্টাডিজ বা নিম্নবর্গের ইতিহাস।

কুহ্নকে স্মরণ করছেন বটে, কিন্তু রণজিতের এই মডেলটি কুহ্নের থেকে বেশ আলাদা। কুহ্নের দৃষ্টিতে, বিজ্ঞানের নতুন ধারা পুরনোকে টলিয়ে দেয় আবার অবলম্বনও করে — পুরনো অভ্যাসের গর্ভ থেকেই নতুনের জন্ম হয়। রণজিতের প্রস্তাবিত নিম্নবর্গের ইতিহাস কিন্তু পূর্বেকার এলিট ইতিহাস থেকে কোনও অর্থেই উদ্ভূত নয় বা তার উপর নির্ভরশীল নয়। 'Subaltern Studies'-এর প্রথম সংকলনের ভূমিকায় তিনি বলছেন : 'it neither originated from elite politics nor did its existence depend on the latter' (Small Voice ১৯০)। এর অভিনবত্ব আমূল, সার্বিক। এলিট চিন্তার বৌদ্ধিক নির্মাণের সঙ্গে এর কোনও আপস নেই; বরং সেই নির্মাণকে সে এমন সার্বিকভাবে অস্বীকার করে যে

কোনও নিটোল সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাকেই সে মানতে রাজি নয়: তার চরিত্র অনির্দিষ্ট, অবিন্যস্ত। 'The Small Voice of History' প্রবন্ধে আছে : 'a certain disorderliness ... will be an essential requirement for our revision' (Small Voice ৩১৭)। নিম্নবর্গীয়েরা কোনোদিন সমাজের সমান শরিক হিসেবে গণ্য হয়নি; সেই সমাজের পরিপাটি প্রণালীগুলি তারা মান্য করবে কেন? তাদের নিজস্ব বিকল্প বয়ান অবশ্যই আছে: 'সাবঅলটার্ন' শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই আছে alternative বা বিকল্পের দ্যোতনা। কিন্তু প্রমিত সমাজব্যবস্থা সেই বিকল্পকে গ্রাহ্য করে না; তার চোখে নিম্নবর্গের সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতির মান্যতা দূরে থাক, বলতে গেলে অস্তিত্বই নেই। ফলে সেই ব্যবস্থার সঙ্গে নিম্নবর্গীয় বয়ানের মসৃণ সংযোগ কোনওমতেই সম্ভব নয়, অমিল ও অসঙ্গতি থাকতে বাধ্য।

তাই বলতে হয়, ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গীয়ের অন্তর্ভুক্তি কেবল নতুন বিষয়বস্তুর প্রবেশ নয়, বা নয় কেবল পদ্ধতিগত উদ্ভাবন; তা হল দস্তুরমত অভিনব এক জ্ঞানপ্রণালী, epistemological shift — জ্ঞানবস্তুকে নতুনভাবে চেনা ও বোঝা, যার ফলে বিদ্যাক্ষেত্রের পুরো চিত্রটাই নতুন করে আঁকা হচ্ছে; বা আরও সঠিক বললে, পুরনো চিত্রটাকে অবিনির্মাণ (deconstruct) করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে এটা নীতি ও মূল্যবোধের বিপ্লবও বটে, ইতিহাসের উপাদানকে এক নতুন মানবিক মাত্রা দান করে, পুরো অতীতটাই নতুন মানবিক প্রেক্ষিতে দেখে।

জীবনের নবম দশকে রণজিৎ গুহ বিদ্বানসমাজকে তাক লাগিয়ে পরপর কয়েকটি বই প্রকাশ করলেন যা তাঁর পূর্বেকার অধিকাংশ রচনা থেকে আপাতভাবে সম্পূর্ণ আলাদা। সবগুলি বই বাংলা ভাষায়। বাংলায় রণজিৎ আগেও অনেক লিখেছেন, কিন্তু এত একনিষ্ঠভাবে নয়। আরও বড় কথা, এই নতুন বইগুলির প্রধান বিষয়বস্তু সাহিত্য, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য নিয়েও তিনি আগে যথেষ্ট লিখেছেন, কিন্তু এভাবে তা নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে পড়েননি। মনে হতেই পারে, শেষ জীবনে রণজিৎ জ্ঞানগর্ভ ওজনদার ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে ছুটি নিয়ে একটু হাঁফ ছাড়তেই মাতৃভাষা এবং সাহিত্যপাঠের শরণ নিলেন।

বইগুলি পড়লে এই ধারণা পালটাতে বাধ্য। তাদের বিষয়বস্তু সূক্ষ্ম ও দুরূহ। রণজিতের বাংলা গদ্য তাঁর ইংরাজির চেয়ে মোটেই সহজপাঠ্য নয়, বরং আরও কঠিন। এই আপাত ভিন্নধর্মী লেখায় রণজিৎ তাঁর আগের চর্চা থেকে মোটেই সরে আসছেন না, বরং আরও গভীরে প্রবেশ করছেন, তার কয়েকটি অন্তরস্থ তাৎপর্য মেলে ধরছেন।

শেষ জীবনের প্রথম বাংলা বই 'কবির নাম ও সর্বনাম'-এ তিনি বলছেন, 'ভাষাতত্ত্বের শিক্ষা এতই বহুমুখী ও মূলগত যে তার তাৎপর্য অস্তিত্বের শিকড় পর্যন্ত নেমে যায় কবিতা তথা সাহিত্যের সীমা ছাড়িয়ে। কারণ ভাষা বাদ দিয়ে মানুষকে ভাবা যায় না' (সর্বনাম ১৯)। বলছেন, 'ভাষার সঙ্গে অস্তিত্বের নাড়ির যোগ' আছে (সর্বনাম ২৬)। ফলে ইতিহাসের নথি বা উপাদানের ভাষা যেমন মৌলিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, আমরা কী ভাষায় তার বিশ্লেষণ করছি সেটাও কম নয়। ইতিহাস ও ইতিহাসচর্চার এই ভাষাগত মাত্রা সম্বন্ধে রণজিৎ গোড়া থেকে সচেতন, তাঁর কিছু প্রামাণ্য রচনায় তা প্রত্যক্ষ ফুটে উঠছে। যেমন 'The Prose of Counter-Insurgency' প্রবন্ধে (Small Voice ১৯৪-২৩৮) তিনি বিদ্রোহের ভাষা এবং বিদ্রোহ দমনের ভাষার বিশ্লেষণ করছেন রোলাঁ বার্তের উপচার ও লক্ষণার (metaphor ও metonymy) তত্ত্বের আদলে, যার পিছনে আছে এ বিষয়ে রোমাঁ ইয়াকবসনের প্রামাণ্য চিন্তা। সব চেয়ে বলার মতো কথা, বার্তের অনুসরণে রণজিৎ এই তত্ত্ব প্রয়োগ করছেন কেবল ভাষার খুঁটিনাটি ব্যবহারে নয়, ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী, সিদ্ধান্ত, এমনকি কাজকর্ম আচারব্যবহারে। উপচার আর লক্ষণা এখানে কেবল ভাষার অলঙ্কার নয়, বাস্তব ব্যবহারিক জীবনের সূত্র।

জীবনভর ইতিহাসচর্চায় তার মৌলিক ভাষাগত ও ভাষাশ্রয়ী কাঠামোর যে গূঢ় উপস্থিতি রণজিৎ স্বীকার করে এসেছেন, সেটাই যেন শেষ জীবনে নতুন আস্বাদের এই রচনাগুলিতে তিনি প্রত্যক্ষে এনে আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য করতে চেয়েছেন। এই নতুন প্রেক্ষিত আরও স্পষ্ট করার জন্য আলোচনার বিষয়ও করেছেন নতুন — ইতিহাস বা সমাজবিদ্যা নয়, সাহিত্য, যেখানে ভাষার ভূমিকা সবচেয়ে স্পষ্ট, সবচেয়ে স্বীকৃত।

এই ভাষাগত আলোচনার একটা অভিনব দিক হল সর্বনাম নিয়ে রণজিতের ঔৎসুক্য। সহজ করে বলতে গেলে, প্রত্যেক মানুষ নিজের কাছে 'আমি', আর সকলে 'সে' বা 'তারা'। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এই ব্যবধান তো সমাজগঠনে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে উঠতে পারত। তা যে হয়নি, তার কারণ 'আমি' আর 'সে'র মাঝখানে আছে 'তুমি' — এই তাত্ত্বিক অর্থেও 'মধ্যম' পুরুষ, 'আমি' আর 'সে'র মধ্যে সেতুবন্ধন করছে। 'সে'কে যখন 'তুমি' বলে ডাকি, আমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন হয়। 'আমি' আর 'তুমি'র এই নিরন্তর লীলা রণজিৎ সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে খুঁজে পাচ্ছেন গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি-তে (রণজিতের আখ্যায় 'ত্রিগীত'-এ) মানবাত্মার আর দেবতার বৈচিত্র্যময় সম্পর্কে। নিম্নবর্গের ইতিহাসের থেকে এর চেয়ে ভিন্নধর্মী বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া কঠিন; কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের এই যে ভাষালব্ধ ভাষাশ্রয়ী চিন্তা রণজিৎ তুলে ধরছেন, ইতিহাসচর্চার আমূল ভিন্ন ক্ষেত্রেও একই বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া তাঁর নজর কেড়েছে।

রণজিৎ বলছেন :

> 'তুমি' থাকলেই তার সঙ্গে জোড়বাঁধা 'আমি'টিও থাকবে। যতকাল মানুষ আছে, তার ভাষা আছে, ততকাল এ-জোড় ভাঙার নয়। (সর্বনাম ১৯)

সব 'আমি', সব 'তুমি'র মেলবন্ধন একত্র হয়ে সৃষ্টি করে গোটা সমাজের বন্ধনসূত্র; সেই সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তি-মানুষ, ব্যক্তি-নাগরিক তার অবস্থান খুঁজে পায়। রণজিৎ আরও বলছেন :

> ভাষার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের যে সম্পর্ক রচিত হয়, তাই তার সংসার। ... ভাষার কাজই হলো শব্দের স্বরে শ্বাসে-প্রশ্বাসে একজনের কথা আরেকজনকে পৌঁছে দেওয়া। (সর্বনাম ২০)

এই যোগাযোগ যখন ছিন্ন হয় বা আদৌ গড়ে ওঠে না, সমাজগঠন অপূর্ণ থেকে যায়, সমাজজীবন অসুস্থ হয়ে পড়ে।

প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে 'আমি' একটাই, 'সে' বা 'তারা' অগুনতি। বলা যায়, 'আমি'র ধারণাটা উল্লম্ব, vertical; 'তুমি'র ধারণা অনুভূমিক, horizontal। ঠিক এই পার্থক্যটাই রণজিৎ খুঁজে পাচ্ছেন এলিট আর সাবঅলটার্ন ব্যাখ্যানের মধ্যে : 'Mobilization in the domain of elite politics was achieved vertically whereas in that of subaltern politics this was achieved horizontally' (Small Voice ১৯০)। এই বৈপরীত্যের বিষময় ফল তিনি দেখছেন এলিট গোষ্ঠীচেতনা ও ইতিহাসচর্চা থেকে নিম্নবর্গের চেতনা ও ইতিহাসের সম্পূর্ণ বর্জনে : 'There were vast areas in the life and consciousness of the people which were never integrated into [the elite] hegemony.' এটাকে তিনি বলছেন উচ্চবর্গের ব্যর্থতা, *'the failure of the Indian bourgeoisie to speak for the nation'* (তদেব : বক্রাক্ষর লেখকের)।

শেষ পর্যায়ের বাংলা রচনায় এই ব্যর্থতা, এই বিচ্ছিন্নতাকেই রণজিৎ দেখছেন সর্বনামের বিপর্যয় হিসাবে : উচ্চবর্গের চোখে নিম্নবর্গীয়রা 'ওরা'ই রয়ে গেল, 'তোমরা' আর হয়ে উঠল না, 'আমরা' তো নয়ই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, সমাজের চিরাচরিত উচ্চ-নীচের ব্যবধান আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ল

ঔপনিবেশিক সভ্যতার প্রভাবে। এই অভাব বা বিকার শোধরাবার উদ্দেশ্যেই সাবঅলটার্ন চর্চার প্রবর্তন। তা কেবল তথ্যগত এমনকি তত্ত্বগত ইতিহাসচর্চা নয়, সামাজিক তথা নৈতিক পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা।

রণজিতের চেতনায় এই বিচ্ছিন্নতার দুটি বিশেষ নজিরের কথা বলে আলোচনা শেষ করব। একটি, সাবঅলটার্ন ইতিহাসের একটা বড় অঙ্গ হিসেবে নারীর ইতিহাসের গুরুত্ব। 'The Small Voice of History' শেষ হচ্ছে এই প্রসঙ্গ তুলে। বিষয়টি বিস্তারে চর্চিত হচ্ছে 'দয়া' বইটিতে। রণজিতের শেষ পর্যায়ের রচনার মধ্যে একমাত্র এটিরই বিষয় সাহিত্য নয়, সমাজ ও সমাজচিন্তার ইতিহাস, রামমোহন ও সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন ঘিরে।

সতীদাহের বিরোধিতায় রামমোহন শাস্ত্রবিচার করেছেন, যুক্তির অবতারণা করেছেন, কিন্তু শেষ অবধি সব ছাপিয়ে আবেদন করছেন প্রতিপক্ষের মানবিকতার উপর: 'দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহাদিগের প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিতি হয় না...' (দয়া ২৬)। জানি না, এ প্রসঙ্গে রণজিতের মনে পড়েছিল কিনা আরিস্ততলের কাব্যতত্ত্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সেই বিখ্যাত সূত্র : ট্রাজেডির নায়কের দুর্দশা দেখে আমাদের দুটি অনুভূতি হয়, করুণা বা সমবেদনা এবং ভীতি (প্রচলিত ইংরেজি অনুবাদে pity আর fear)। করুণার উদ্রেক হয় বিনা দোষে কারও অনুচিত (undeserved) দুঃখ-দুর্দশা দেখলে, ভীতি এমন কারও দুর্দশা দেখলে যে আমাদেরই মতো, অর্থাৎ আমাদেরও একই গতি হতে পারত — আক্ষরিক অর্থে 'মমত্ব'। তাঁর অলঙ্কারতত্ত্বের ২য় ভাগের ৮ম অধ্যায়ে করুণার মধ্যেও আরিস্ততল খুঁজে পাচ্ছেন এই দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া। এই তত্ত্বের মূলে আছে সর্বনামতত্ত্ব : 'আমি' আর 'সে' মিলে যাচ্ছে, 'সে'র রূপান্তর ঘটছে এক অনুমিত 'তুমি'তে।

মোটামুটি একই জায়গায় রণজিৎ পৌঁছচ্ছেন একটু ঘুরপথে। 'দয়া' বোধকে তিনি অভিহিত করছেন 'অনুভূতি' বলে। অনুভূতি পুরোপুরি মনোগত বা আত্মগত, রণজিতের ভাষায় স্বগম (subjective), বাহ্য বা বাস্তবচলিত নয়। সেই অনুভূতি যদি হয় দয়া, যার সংজ্ঞাই হচ্ছে একজনের প্রতি আর এক জনের প্রতিক্রিয়া, ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুরোপুরি সর্বনামিক, 'সে'কে 'তুমি'তে পরিণত করে 'আমি'র সঙ্গে তার আক্ষরিক অর্থেই 'আত্মিক' যোগ, দুই 'আত্ম' বা 'আমি'র যোগ। উপরন্তু সতীদাহের প্রসঙ্গে তা ঘটছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চরম ও উৎকট অভিব্যক্তির আবহে। অর্থাৎ সর্বনামের সঙ্গে এসে পড়ছে আর একটা ভাবনা, অন্য সব তাৎপর্যের পাশাপাশি নিছক ব্যাকরণ বা ভাষাপ্রক্রিয়ার স্তরেও যার একটা তাৎপর্য আছে : তা হল লিঙ্গ।

শেষ করার আগে একটু দেখা যাক রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে রণজিতের পরবর্তী বই ছয় ঋতুর গান । এর মূল বিষয় কবির প্রকৃতিচেতনা। কিন্তু গোড়ার দিকে একটা অংশে রণজিৎ আলোচনা করছেন বর্তমান আর অতীতের সম্পর্ক, বর্তমানের মধ্যে অতীতের উপস্থিতি, এবং এইভাবে নিকট আর দূরের মধ্যে যোগস্থাপন। 'অধরা মাধুরী' গানটির মর্মে তিনি খুঁজে পাচ্ছেন তিনটি সূত্র : 'অধরা ও ধরা, দূর ও নিকট, অতীত ও বর্তমান' (ঋতু ১৬)। এগুলি ইতিহাসের প্রসঙ্গও বটে :

> বিস্মৃতিই স্মৃতির দোসর হয়ে অতীত থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়ে অভিজ্ঞতাকে সাজায় বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ বা বিষয় অনুযায়ী। ঠিক যেমন ঐতিহাসিক আখ্যানে...অতীতের অনুকীর্তন করা হয় রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনে বা চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আখ্যায়কের বিচারবুদ্ধি অনুসারে নির্বাচিত ঘটনাবলী নিয়ে। (ঋতু ২৩)

অনুভূতির মতো স্মৃতিও ব্যক্তিগত, আত্মগত। কোনও মানুষের স্মৃতি একান্ত তারই, তা নিয়ন্ত্রণ করে তার নিজস্ব চেতনা। রণজিৎ দেখতে চাইছেন, প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের কোন পর্যায়ের স্মৃতি কীভাবে উদ্ধার করছেন। স্মৃতির এই ক্রিয়াকে রণজিৎ দুটি শ্রেণিতে ভাগ করছেন: একটি 'ঐতিহাসিক',

অপেক্ষাকৃত দূরের ঘটনার অপেক্ষাকৃত বাস্তব ও নিরপেক্ষ প্রতিফলন; অন্যটি 'আস্তিত্বিক' (ধরে নিচ্ছি existential-এর অনুবাদ), আরও সাম্প্রতিক ঘটনার স্মৃতি, বেশি করে মনের মাধুরী মিশিয়ে। শেষ জীবনে পৌঁছে কবি যেন উত্তরোত্তর ঝুঁকছেন এই আত্মপ্রসূত 'অনির্দেশ্যের' দিকে : যে অভিজ্ঞতার সূত্রপাত সুনির্দিষ্ট বাস্তবে, তাও ক্রমে বাস্তবের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও ব্যাপক অনির্ণীত রূপে পর্যবসিত হচ্ছে :

> একদিকে জ্ঞেয় ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েও তা আরেকদিকে পৌঁছে গেছে অনির্দিষ্টের সীমান্তে। আস্তিত্বিক দূরত্বও তার ফলে অনির্দেশ্যতায় আক্রান্ত। (ঋতু ২৬)

এর সঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাসের সম্পর্ক কী, ভাষাগত বা সর্বনামিক বিচারেরই বা কী? মনে পড়তে পারে, 'The Small Voice of History'তে রণজিৎ বলেছেন নিম্নবর্গের ইতিহাস অভ্যস্ত এলিট ইতিহাসের চেহারা শুধু পালটে দেয় না, এলোমেলো করে দেয় : তার অবধারিত লক্ষণ একটা অনির্দিষ্ট অবিন্যস্ত ভাব, 'a certain disorderliness' ('Sall Voice' ৩১৭)। 'ছয় ঋতুর গান'-এ তিনি একই কথা বলছেন সমাজ বা জাতি নয়, ব্যক্তিবিশেষের অতীত জীবন সম্বন্ধে; কিন্তু এভাবে ইতিহাসের বৃহত্তর ধারাকেও একটা নতুন মানবিকতায় সিঞ্চিত করছেন, অন্যত্র যেমন করছেন ভাষার মৌলিক মানবিকতার আবাহন করে। 'ছয় ঋতুর গান'-এর এই আলোচনায় ভাষা বা ব্যাকরণগত কোনও উপাদান আপাতভাবে নেই। কিন্তু যেভাবে তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালের ত্রিধারার কথা বলছেন, সেগুলিকে আরও সূক্ষ্মভাবে ভেঙে সাজাচ্ছেন ধাপে-ধাপে পর্যায়ক্রমে, তাতে ভাষায় ব্যাকরণের কাল (tense) এবং প্রকার (aspect)-এর কথা মনে না হয়ে যায় না।

শেষ করি রবীন্দ্রনাথের 'এপারে-ওপারে' কবিতাটি নিয়ে রণজিতের আলোচনা দিয়ে। কবি জোড়াসাঁকোর জানলায় বসে দেখছেন চিৎপুর রোডের ওপারে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘিঞ্জি বসতি — কবির থেকে মানসিকভাবে দুর্গম, বিচ্ছিন্ন, 'আত্মীয়তার' অর্থাৎ কবির 'আমি'র নাগালের বাইরে। কবি স্বীকার করছেন, সেটা তাঁরই অক্ষমতা :

> আপনার উচ্চতট হতে
> নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

'আপনার' অর্থাৎ তাঁর নিজের অবস্থানের 'উচ্চতট', তাঁর অক্ষম 'আমি', যা 'সমস্ত' 'ওদের'কে 'তোমরা'য় পরিণত করতে পারে না, তাদের সঙ্গে মিলতে পারে না নিজের সীমিত 'আমি'র প্রসার ঘটিয়ে। এই আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে একের পর এক কবিতায় ফুটে উঠছে। চাষী, তাঁতি, জেলে,

> বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
> তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
> অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
> সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে। ('জন্মদিনে' #১০)

'উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে': 'এপারে-ওপারে'তে যা ছিল বাস্তব অবস্থান, এখানে তাই হয়ে উঠেছে রূপক বা প্রতীক। কবি তাই আহ্বান করছেন 'অখ্যাতজনের / নির্বাক মনের' কবিকে :

তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি...

'তুমি', 'তাহারা', এবং 'আপনারি' অর্থাৎ এই 'নির্বাক' মানুষদের সুপ্ত 'আমি' — সব মিশে যাচ্ছে সর্বনামের ঐকতানে, কবির উল্লেখিত 'সাহিত্যের ঐকতানসভা'র নেপথ্যে, গভীরে। এ ধরণের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সাতচল্লিশ বছর আগে, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় : 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে / দিতে হবে ভাষা।' সেই সংকল্প কিন্তু যতই মহান হোক, তার মেজাজ ছিল দান বা অনুকম্পার, অতএব দূরত্বের, বিচ্ছিন্নতার, এমনকি বৈপরীত্যের। 'এপারে-ওপারে'তেও কবি সেই দূরত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেননি, কিন্তু 'উচ্চ মঞ্চে' থেকেও অচেনা অনাত্মীয় মানুষগুলোকে তিনি দেখছেন সাধারণ মানবিকতার সমতলভূমিতে দাঁড়িয়ে। তাঁর ভাষা তাই আপনা থেকেই বিন্যস্ত হচ্ছে সর্বনামিক ছকের আদলে, 'এবার ফিরাও মোরে'-তে যার অবকাশ ছিল না।

উপসংহারে তাই একটি জল্পনা : নিম্নবর্গের ইতিহাসের উদ্ভাবনে কি রবীন্দ্রনাথের কোনও অবদান ছিল? রণজিৎ কি তাঁর শেষ জীবনের রচনায় সেই ঋণ শোধ করে গেলেন?

সূত্রনির্দেশ :

রণজিৎ গুহ, কবির নাম ও সর্বনাম । কলকাতা : তালপাতা, ২০০৯। (সংক্ষেপে সর্বনাম)

রণজিৎ গুহ, ছয় ঋতুর গান। কলকাতা: চর্চাপদ, ২০০৯। (সংক্ষেপে ঋতু)

রণজিৎ গুহ, দয়া : রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা । কলকাতা : তালপাতা, ২০১০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৬+২ খণ্ড। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮০-২০০৪।

Guha, Ranajit, The Small Voice of History, ed. Partha Chatterjee. Ranikhet- Permanent Black, 2009 : 'Some Aspects of the Historiography of Colonial India' (Subaltern Studies vol.1), 187-93; 'The Prose of Counter-Insurgency', 194-238; 'The Authority of Vernacular Pasts', 475-8. (সংক্ষেপে Small Voice)

সুকান্ত চৌধুরী : প্রাবন্ধিক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক।